সংবাদ

তারিখ 03 AUG 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ছাত্র আন্দোলনে নতুন চ্যালেঞ্জ

সময়ের কথা | অজয় দাশগুপ্ত

সাংবাদিক

জাতীয় ছাত্রলীগ ছিল বাকশালের (১৯৭৫ সালের ৭ জুন গঠিত বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) ছাত্র সংগঠন। শেখ শহীদুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এবং মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও নূহ-উল-আলম লেনিনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীদের নিয়ে জাতীয় ছাত্রলীগ গঠন করা হয়। ষাটের দশকে এ দুটি ছাত্র সংগঠন ছিল প্রায় সমান জনপ্রিয়। আইয়ুব খানের কুখ্যাত সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলায় এ দুটি ছাত্র সংগঠন ১৯৬২, ১৯৬৪ ও ১৯৬৯ সালে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তাদের ডাকে আমতলা-বটতলা পূর্ণ হয়ে যেত। রাজপথ প্রকম্পিত হতো। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সে সময়ে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯৬১ সালে তার বয়স ছিল ৪১ বছর) সঙ্গে মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের গোপন বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। শেখ মুজিবুর রহমান তখনই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন– পাকিস্তানের 'পাঞ্জাবি পুঁজিপতি-ভূস্বামীদের' সঙ্গে একত্রে থাকা যাবে না। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবে কমিউনিস্ট নেতারা ছিলেন এ প্রশ্নে রক্ষণশীল। তারা মনে করতেন, পাকিস্তানের শাসকরা যেভাবে ইসলাম ধর্ম ও পাকিস্তান রাষ্ট্রকে জনগণের কাছে এক ও অবিচ্ছিন্ন হিসেবে তুলে ধরছে তাতে পাকিস্তান ভেঙে ফেলে পৃথক রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম শুরু করলে জনসমর্থন নাও মিলতে পারে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তারা প্রচার করেছিল– পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা এসে আন্দোলন করছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ও আমরা এটা দেখি। তাদের গণহত্যার দুটি বড় টার্গেট ছিল– আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং হিন্দু সম্প্রদায়। তারা দেখাতে চেয়েছে– এটা বাঙালিদের সংগ্রাম নয়। আওয়ামী লীগ হিন্দুদের নিয়ে পাকিস্তান ভাঙতে চায়। আর তাতে মদদ দিচ্ছে 'হিন্দু ভারত'। শেখ মুজিবুর রহমান এবং মণি সিংহ একমত হয়েছিলেন– আইয়ুব খানের সামরিক শাসন হটাতে তাদের অনুগামী দুই ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন একযোগে আন্দোলন করবে। ১৯৬২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এ দুটি ছাত্র সংগঠন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে এবং রাজপথে এমন আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, যার পরিণতিতে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথ খুলে যায়। এখন ছাত্র ইউনিয়ন অনেক দুর্বল সংগঠন। দেশের কোনো প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার মতো সমর্থন তাদের নেই। ষাটের দশকে এ সংগঠনটি ছিল দেশের বেশিরভাগ এলাকায় বিস্তৃত। তারা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে জনগণকে মুক্ত করার ওপর জোর দিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও এটা চাইতেন মনেপ্রাণে। বাংলাদেশে সুস্থ ও গণমুখী সংস্কৃতির চর্চার সঙ্গেও এ সংগঠনটির নাম ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ষাটের দশকে এ সংগঠনের সব অনুষ্ঠানে 'আমার সোনার বাংলা...' এবং 'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা...' গান দুটি গাওয়া হতো। রমনা বটমূলে ছায়ানট পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান শুরু করে ১৯৬৭ সালে। সকালের এ অনুষ্ঠানে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী-সমর্থকরা দলে দলে যোগ দিত। এ সংগঠনের অন্যতম নেতা জাহিদুর রহিম 'আমার সোনার বাংলা...' গাইতেন চমৎকার। বাঙালি সংস্কৃতির চর্চায় ছাত্র ইউনিয়নের বিশেষ আগ্রহের কারণে সে সময়ে ছাত্রলীগের কোনো কোনো নেতা, বিশেষ করে নুরে আলম সিদ্দিকী তাদের বিদ্রূপ করে বলতেন– 'হারমোনিয়াম পার্টি'। তবে বঙ্গবন্ধুর আগ্রহেই ১৯৭০ সালের ৩ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠানের শুরুতে 'আমার সোনার বাংলা...' গেয়েছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের জাহিদুর রহিম। বঙ্গবন্ধু ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে ছাত্রলীগের মৈত্রীর গুরুত্ব ষাটের দশক থেকেই উপলব্ধি করেছেন। ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। ১৯৭৫ সালে জাতীয় ছাত্রলীগ গঠনে তারই আগ্রহ ছিল বেশি।

৭ জুন এ সংগঠনের আত্মপ্রকাশের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটি ছিল। এরপর ক্লাস শুরু হয় ১ জুলাই থেকে। জাতীয় ছাত্রলীগ নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে– নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের (তখন ৩০-৩৫টি বিভাগ ছিল) ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা নিজ নিজ বিভাগে সমবেত হবেন। সেখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের ফুল দিয়ে সম্মান জানাবে। তারপর বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা একত্রে মিছিল করে যাবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। এর নেতৃত্বে থাকবেন উপাচার্য ড. আবদুল মতিন চৌধুরী। সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মিছিল যাবে জগন্নাথ হলের গণকবরে (১৯৭১ সালে এই জগন্নাথ হলেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষককে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হত্যা করেছিল)। এরপর মিছিল যাবে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ কয়েকজন শিক্ষকের কবরে ফুল দিতে। গোটা অনুষ্ঠানটি ছিল ভাবগম্ভীর্যপূর্ণ। আয়োজন ছিল নিখুঁত। ক্যাম্পাস হয়ে উঠেছিল আনন্দমুখর।

সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে জনপ্রিয় আরেকটি ছাত্র সংগঠন ছিল জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগ। তারা 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' স্লোগান দিত এবং শেখ মুজিবের শাসন উৎখাতের জন্য সক্রিয় ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিন ছাত্রছাত্রীরা একত্র হয়ে শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানাবে, ফুল দেবে– এ ধরনের কর্মসূচি তাদের কাছে মনে হতো 'সংস্কারবাদী', যার লক্ষ্য ছাত্রসমাজকে বিপ্লব থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া। কয়েকটি বামপন্থি ছাত্র সংগঠনও (যাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমর্থন তেমন ছিল না) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের বক্তব্য প্রচার করত। সে সময় শেখ শহীদুল ইসলাম ও মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দেশের সব প্রতিষ্ঠানেও সেশনের প্রথম দিন– শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানাবে– এমন কর্মসূচি গ্রহণে আগ্রহী ছিল। তবে এটা ছিল প্রতীকী। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশোনা ও গবেষণা চর্চা বাড়াতে এ সংগঠনটি সচেষ্ট হয়েছিল।

এ সংগঠন ওই বছরের জুলাইয়ের প্রথম দিকে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দিয়েছিল। স্বাধীনতার পর এ ধরনের আয়োজন ছিল প্রথম (অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ডাকসুর ব্যানারে)। জাতীয় ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসে সিট দখল ও ক্যান্টিন-ডাইনিং হলে ফাও খাওয়া বন্ধ করতে পেরেছিল। ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা যেন কোনোভাবেই ঠিকাদারি কাজে যুক্ত না হয় কিংবা তাদের কাছ থেকে কমিশন না নেয়, সে জন্যও কেন্দ্রীয়ভাবে তৎপরতা ছিল।

সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে পাঁচজন ছাত্র প্রতিনিধি ছিল– শেখ শহীদুল ইসলাম, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, মাহবুব জামান, ইসমত কাদির গামা ও অজয় দাশগুপ্ত। তারা গণমুখী শিক্ষা নীতি চূড়ান্ত করা, পরীক্ষায় নকল বন্ধ, স্বাধীনতার পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় কিছু নির্বাচিত কলেজে অনার্স কোর্স চালু, বয়স্কদের সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ভলান্টিয়ার হিসেবে গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সিনেটে তৎপর ছিলেন। স্বাধীনতার পর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকল প্রবণতা উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতারা আন্তরিকভাবে চাইছিলেন নকল বন্ধ হোক।

এসব কর্মসূচি কতটা সংস্কারবাদী কিংবা কতটা বাস্তবানুগ– সে বিতর্কে যাব না। তবে ১৯৭৫ সালের বিয়োগান্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যারা এসেছিলেন তারা 'মুজিব গণতন্ত্র হত্যা করেছে' অজুহাত তুলে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় এসে দেশে জারি করেন মার্শাল ল'। মুছে দেয় গণতন্ত্রের নাম-নিশানা। মিছিল-সমাবেশ করা যাবে না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই। রাজনীতি করার অধিকার নেই। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের অনেক নেতাকর্মীকে তারা জেলে পাঠায়। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিন ছাত্ররা শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানাবে– এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণের আর সুযোগ থাকে না। জিয়াউর রহমান গোয়েন্দাদের কাজে লাগিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে নিজের সমর্থক বাড়াতে তৎপর হন। ছাত্র সংগঠন করার জন্যও গোয়েন্দারা টোপ-প্রলোভন দিতে থাকে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে তিনি 'হিজবুল বাহার' নামের জাহাজে সমুদ্র ভ্রমণে যান, যেখানে তাদের বলা হয়– জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গড়ে তোল। এটা ঠিক যে, এ সংগঠনটি পরের বছরগুলোতে দেশের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পায়। কিন্তু বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের যে ঐতিহ্যের কথা আমরা বলি, ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা– এ কালপর্বের যে প্রগতিশীল ধারা, সেটা তারা ধারণ করে না। তারা একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায় না। একুশে ফেব্রুয়ারি তাদের কাছে নিছকই একটি 'আনুষ্ঠানিকতার দিন'। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থক ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের সঙ্গে এসব ইস্যুতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এ ধরনের ছাত্র সংগঠনের পেছনে ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক সমর্থন দেশের জন্য ভালো খবর নয়। গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক চেতনায় উজ্জীবিত ছাত্র সংগঠনগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে– বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র আন্দোলনের ধারায় ছাত্রছাত্রীদের সংগঠিত করা।

আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বরাবরই বড় ছাত্র সংগঠন। তবে স্বাধীনতার পর তারা কখনোই এক নম্বর হতে পারেনি। গণতন্ত্রের সংগ্রামে, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে, একাত্তরের ঘাতকদের অপতৎপরতা রুখতে তারা অসম সাহসী ভূমিকা রেখেছে। ১৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগের দুঃসময়ে ছাত্রলীগ প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের রোষ-ক্রোধ সহ্য করেছে। কিন্তু কেন ছাত্র সমাজের মধ্যে এক নম্বর হতে পারছে না, সেটা রহস্যই থেকে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর ছাত্রলীগ কখনও এককভাবে ডাকসু নির্বাচনে জয়ী হতে পারেনি। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর সমর্থন তাদের পক্ষে কমই দেখা গেছে। ২০১৩ সালে শাহবাগকে কেন্দ্র করে যে গণজাগরণ মঞ্চ গড়ে উঠেছিল, তা ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। এ আন্দোলনের সামনের সারিতে ইমরান এইচ সরকার, লাকী আক্তার প্রমুখ থাকলেও প্রথম দিকে জমায়েতে মূল ভূমিকা রেখেছে ছাত্রলীগ। তাদের সমর্থকরা দলে দলে মিছিল নিয়ে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্লোগান দিয়েছে; কিন্তু মঞ্চে বক্তৃতা দিয়েছে অন্যান্য সংগঠনের নেতারা (যাদের বেশিরভাগের সমর্থন তেমন নেই)। হেফাজতে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামী-ছাত্রশিবির যখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য নতুন উদ্যমে জঙ্গি মনোভাব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন তাদের রুখতে ছাত্রলীগ নিয়েছিল বড় ভূমিকা।

কিন্তু এ সংগঠনটি কেন যুগ যুগ ধরে বড় ছাত্র সংগঠন থেকেও জনপ্রিয়তায় এক নম্বরে উঠে আসতে পারছে না? বাংলাদেশকে গড়ে তোলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরলস প্রয়াস বিশ্বব্যাপী নন্দিত হচ্ছে। দেশেও এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত যে, তিনি দেশকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে দৃঢ়সংকল্প। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতোই আপসহীন। কিন্তু কেন তার সমর্থনপুষ্ট ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করতে পারছে না? কেন তাদের বিভিন্ন ইউনিটের কর্মীরা অভ্যন্তরীণ কোন্দল-সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে? ১৯৭৫ সালের ৭ জুন থেকে ১৪ আগস্ট– এই সংক্ষিপ্ত সময়ে জাতীয় ছাত্রলীগ যে ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল, ছাত্রলীগ নেতৃত্ব কি সেটা অনুসরণের কথা ভাবতে পারে না? সে সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস-নৈরাজ্য সৃষ্টির অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যাদের বিতাড়ন করা হয়েছিল, তারাই কিন্তু পরে সামরিক শাসকদের সঙ্গে যোগ দেয়। ছাত্রলীগ নেতৃত্ব নিশ্চয়ই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবেন। বড় সংগঠন থেকে এক নম্বরে উন্নীত হওয়ার চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে। সেটা অর্জিত হতে পারে কেবল ছাত্রছাত্রীদের সমর্থন পেলেই। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট মনোভাব থাকে। তারা সরকারের কাজের বিষয়ে সমালোচনামুখর থাকে। কিন্তু এটাই কি ছাত্রলীগের এক নম্বর সংগঠন না হওয়ার কারণ? এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয়-জেলা-উপজেলা পর্যায়ের নেতাদের দায়দায়িত্বও কম নয়। ঐতিহ্যবাহী এ সংগঠনটি যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শিক্ষা ও ছাত্রসমাজের স্বার্থেই কেবল তৎপরতা চালায়, সেটা নিশ্চিত করা চাই। তাতেই ওপরে ওঠার সিঁড়ি ভাঙা যাবে নির্ভাবনায়।

ajoydg@gmail.com